"গীতারত্ন" শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ প্রবর্তিত ধর্ম ও জাতীয়তাবাদী বাংলা মাসিক পত্রিকা (৬৫ তম বর্ষ)

পার্থসারথি

(মুদ্রণ : জুন, ১৯৬০ থেকে মার্চ, ২০২০ / অন্তর্জালে প্রকাশ : এপ্রিল, ২০২০ থেকে)

Website: https://www.parthasarathipatrika.com

৫৮তম অন্তর্জাল সংখ্যা

১০ই মাঘ, ১৪৩১ / ২৪.০১.২০২৫

-: সম্পাদক :-

সুনন্দন ঘোষ

-: সূচীপত্র :-

প্রীতি-কণা	শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ
স্মৃতিচারণ	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
শ্রীপঞ্চমী স্মরণে	স্বামী বিজ্ঞানানন্দ সরস্বতী
জীবনে আচরণীয় গীতার শিক্ষা	ভূমানন্দ
বহুরূপী মৃত্যু	শ্রী বীরেন্দ্র চন্দ্র সরকার
মন চলে হিমাচলে	শ্রী অরূপ কুমার ভট্টাচার্য্য
স্বামী বিবেকানন্দ	শ্রী শান্তশীল দাশ
মুখ নেই	শ্রী সুনন্দন ঘোষ

Founded by Sri Priti Kumar Ghosh in June, 1960, PARTHASARATHI Bengali Monthly Magazine, RNI 5158 / 60, published in print format for sixty years, then converted to e-magazine by Sri Sunandan Ghosh, Editor & Publisher in April, 2020 during prolonged Nationwide Lockdown and now being published through the Website: https://www.parthasarathipatrika.com

Contact: 182 Jessore Road, Flat- D/1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 9433284720.

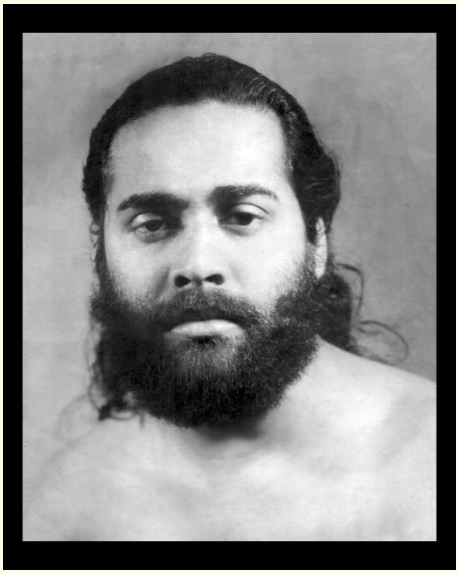

(১০ই মার্চ, ১৯২৬ – ২৪শে নভেম্বর, ১৯৮৬)

প্রীতি-কণা

"এই বিশ্বটাই ভগবানের কর্মলীলা। এই দিব্যকর্ম করতে হবে আত্মসংযমের দ্বারা। আত্মসংযম বলতে নিগ্রহ নয়। জোর করে ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় থেকে নিবৃত্ত করলেই আত্মসংযম হয় না। মনকে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে লাগিয়ে রেখে ফলের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কর্ম করাই আসক্তি এবং আসক্তি বর্জন করে কর্ম করাই কর্মযোগের মূল কথা।"

স্মৃতিচারণ **শুক্লা ঘোষ**

প্রথমেই পাঠকবর্গকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই। তারপর দুঃখের খবরটা দিই। আগামী আষাঢ় মাস থেকে পার্থসারথির বার্ষিক মূল্য পঁচিশ টাকা ধার্য্য হয়েছে। যাঁরা খুব আগ্রহ সহকারে তাড়াতাড়ি মানি অর্ডার করেছেন ১৫ টাকা করে, তাঁরা দয়া করে আরও দশ টাকা অতিরিক্ত পাঠাবেন। তা নয়তো আমাদের পক্ষে পত্রিকাটি প্রকাশ করা একেবারেই সম্ভব নয়। যাঁরা যাঁরা গ্রাহক থাকবেন না, তাঁদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি।

গত ১০ই মার্চ (১৯৯২) আমরা শ্রীপ্রীতিকুমারের ছেষট্টিতম জন্মদিন পালন করলাম। সেদিনকার অনেক কাজই আমার খুব মনের মত হয়েছে। নীরেনদা বরাবরই সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেন, এবারও করেছিলেন। গান গাইলেন শ্রীশক্তিব্রত দাস। সে গান সেদিন যাঁরা না শুনেছেন তাদের জন্য আমার দুঃখ হয়েছে। অনেকে তো এসে আমাদের ধন্য করেন। আমার মনে হয় শ্রীপ্রীতিকুমারের জন্মদিনে যাঁরা না আসেন তাঁরা নিজেদের বঞ্চিত করেন। এবার জার্মানীর রেখা শিকদার কলকাতায় ছিল। সন্ধ্যায় আমার হাত দুটি ধরে উচ্ছ্বসিত হয়ে সে যখন বলে ফেললো, "বৌদি, কি ভালো লাগছে, সমস্ত বাড়ীটা যেন উজ্জ্বল মনে হচ্ছে..."– শুনে আমিও তাকে জড়িয়ে ধরলাম। আমরা মানুষকে দূরে সরিয়ে দিই আমাদের নিজেদের কারণে। তাকে যে আবার আপন করে ফিরে পাওয়া যায় এ শিক্ষা আমি পেলাম কবে? গত ছয় বছরে নিজেকে তিল তিল করে শক্ত করেছি। কই, বলতে তো পারছি না বড় গলায়- "কা তব কান্তা কস্তে পুত্রাঃ!" – আমাদের সবাইকে চাই। একটা বাদ দিয়ে অন্যটার উপর ভরসা করতে পারি কোথায়? পারলে ঈশ্বরও কি এত শাস্তি দিতেন?

আজ কাগজে দেখালাম চিঠিপত্রে এক ভদ্রলোক বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের স্বেচ্ছামৃত্যুর ব্যবস্থা করবার উপর জোর দিয়েছেন। মানুষের জীবন সবচেয়ে অমূল্য সম্পদ। কত

হতাশ হলে, ব্যথা পেলে মানুষ সেই জীবনের সমাপ্তি ঘটায়। আজ আমার স্বীকার করতে লজ্জা নেই সেই মৃত্যুকেই আমি চাই। আমি শুনেছিলাম স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে বেশী ভাব থাকলে একজনের মৃত্যুর দু'বছরের মধ্যে অন্যজনও চলে যান। আমার বাবা ও মায়ের মধ্যে কি ভীষণ ভাব ছিল। কিন্তু আমার মা গত হবার ৩১ বছর পর আমার বাবা মারা যান। আমাদের বাড়ীতে একটি ছেলে থাকতো। স্বামী একটু অসুস্থ হলেই তার মায়ের গলা দিয়ে জল নামতো না। স্বামী চলে গেছেন ১৫ বছর হয়ে গেল। ভদ্রমহিলা নব্বই বছর বয়সেও সংসার করে যাচ্ছেন। তাই শ্রীপ্রীতিকুমার যখন চলে গেলেন, আমার মনে হয়নি তক্ষুনি আমি চলে যাব। আমার কাছে দুটি বাচ্চা ছিল। হয়ত তাদের মানুষ করবার একটা ক্ষীণ আশা ছিল। বাচ্চা দুটি তাদের মায়ের কাছে চলে গেছে। এতদিন একটা ক্ষীণ আশা ছিল তারা এ' বাড়ীতে ফিরে আসবে। আজ আমি সে আশা করিনা। তার সঙ্গে ত্যাগ করেছি অন্য যে কোন বাচ্চাকে লালন পালন করবার সখ। জীবনের সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে একটা কথা আজ স্বীকার করে যাই – আমি ভীষণ বোকা! একটু মিষ্টি কথাতেই আমি সব ভুলে যাই। শ্রীপ্রীতিকুমার অসম্ভব দূরদ্রষ্টা ছিলেন, তাই বেছে বেছে আমাকে পছন্দ করেছিলেন। তাঁর যোগ সাধনার এ দায় কে নিতে পারতো? নিজের জীবনের বাসনা কামনা কে জলাঞ্জলি দিতে পারতো? পরের জন্য নিজের ঘর কে ছেড়ে দিতে পারতো? আর সেই পথ ধরে কেই বা এক একটি করে শত্রু প্রতিপালন করতে পারতো? আজ শ্রীপ্রীতিকুমার সশরীরে নেই বলে একটু স্বাবলম্বী হতে পারছি। তবু মনে হয় তিনি থাকলে বোধ হয় আমার সংসারে আমাকে অগ্রাহ্য করবার সাহস কারো হত না। আমাকে তিনি সঙ্গ দেননি বা দিতে পারেননি সেটা ঠিক, কিন্তু আমার যে কোনও ইচ্ছার যে কত মূল্য দিতেন তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমি তাঁর কাছে কিছু চেয়েছি অথচ পাইনি এটা আমার জীবনে ঘটেইনি। বেশী জিনিসপত্র কিনে ফেলা, কাউকে কিছু দিয়ে দেওয়া আমার চিরকালের অভ্যাস। আজও আমি সেইভাবে চলবার চেষ্টা করি। বেশী জিনিষের জন্য আমার পুত্র গেল গেল রব তুলেছিলেন। আজ দেখি নিজের স্থান সঙ্কুলান না হলে তিনি আমার জায়গা ব্যবহার করবার জন্য

আগ্রহী হয়েছেন। কিন্তু যা কেনবার জন্য বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়েছে, তা আমারই থাক। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদে চাকরী করা ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া ইঞ্জিনিয়ার ছেলে, তার তো বিয়ের বাজারে দারুণ কদর! সে বিয়ে করবার পর তার যদি কোনও সন্তান হয় সে দায় একজন উচ্চপদস্থ অফিসার নিশ্চয়ই নিতে পারবে। একটা কথা মনে রাখব – যে বাড়িটাতে বাস করি সেটা আমার, যে টাকাটা খরচ করি সেটাও আমার, তাছাড়া আমি হাত পা গুটিয়ে শুয়ে থাকি না। ভালোভাবে থাকতে পারলে থাক নাহলে অন্য কেউ বেশী ভালোবাসলে সেখানে গিয়ে থাকতে পার। মানুষ তো যা পেয়ে যায় তাতে সন্তুষ্ট থাকে না। আবার পেয়ে গেলে তার জন্য আর আকুলি বিকুলিও থাকে না। যা করবে নিজের দায়িত্বে কর। আমি শুধু মিষ্টি কথা বলে সব চাহিদা পূরণ করতে পারবো না।

আমি একটা জিনিসে বিশ্বাস করি মানুষ তার জন্মগত সংস্কারটাকে এড়িয়ে চলতে পারে না। তাছাড়া যাদের তিনি আমার সাথে সহযোদ্ধা রেখে গেছেন তাদের কষ্ট হবে এমন কাজ আমি করি না। স্বামী না থাকলে মহিলারা একটু অসহায় বোধ করেন কেন, আগে বুঝতাম না। এখন বুঝি একটি প্রখর ব্যক্তিত্বের আড়ালে দীর্ঘকাল বাস করলে মানুষ খুব অসহায় হয়ে যায়। নিরাপত্তার অভাব বোধ করে। আমি অবশ্য ততটা বোধ না করলেও কার কখন ইচ্ছে হবে সে কথা বলবে, এ' অবস্থার মুখোমুখি হতে রাজী নই।

আমার কাজকর্মে অনেকে আপত্তি করেন। মামীমা বা বৌদির এত পরিশ্রমের কি দরকার? আজ এই মুহূর্তে বুঝছি দরকার আছে। নিজেকে ব্যস্ত রাখবার থেকে বড় জিনিষ আর কি আছে? কাজ হাতে থাকলে আর সময় কাটাবার চিন্তা নেই। অন্যের কথা নিয়ে আলোচনা করবার দরকার নেই। এখন তো আবার গঙ্গাস্নান, জপতপের মাত্রাও কমেছে। আসল কথা বুঝে নিয়েছি প্রারব্ধ খণ্ডন করা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব, বিশেষ করে আমার মতো যারা সদাসর্বদা টেনশনে ভোগেন। তাই যেভাবে কাটছে কাটুক না কেনো, হুট করে সারেণ্ডার করতে পারিনা।

শ্রীপ্রীতিকুমারের জন্মদিনে নীরেনদাই যথারীতি সঙ্গীতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিলেন। বৌদির যে কোনও ইচ্ছেই তিনি পালন করবার ব্যবস্থা করেন – শুধু তার প্রতি অতিরিক্ত সহানুভূতির জন্য বৌদির সাইনাসে আক্রান্ত হবার ঘটনাটা শ্রীপ্রীতিকুমারের কৌতুক কিনা জানিনা। তবে ভুগছি সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে আমি সহজে কাহিল হবার পাত্রী নই। তাই শেষ দিন পর্যন্ত দেখে যাব কোথায় তিনি আমাকে নিয়ে যান!

আমি জানি আমার স্পষ্ট মতবাদটা অনেকে অপছন্দ করেন। তবু একটা কথা বলব। শ্রীপ্রীতিকুমার আমার এই স্পষ্টবাদিতাকে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। অনেক ক্ষেত্রেই আমার সম্বন্ধে বলেছেন, "ও অভিনয় করতে জানে না।" প্রবাসেও এ' রকম বক্তব্য পেশ করেছিলেন, আমাকে বলেন নি। তাঁর প্রয়াণের পর রেখা জার্মানি থেকে জানিয়েছিল।

শ্রীপ্রীতিকুমার সম্বন্ধে এখন অনেক কথা শুনি। অনেককে অনেক কথা বলে গেছিলেন। সবটা আমার জানা নেই। তবে যেগুলি আমার সামনে ঘটেছে, সেগুলি মনে রাখবার চেষ্টা করি।

গত এক বছরে আমি বহির্জগতের সঙ্গে প্রায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করেছি। এখন আর আমি এনসিসি করিনা। কোনও ক্যাম্পে যাই না, শরীর নেয় না। তাছাড়া কিশোরের অসুখের জন্য আমি মোটামুটি কলকাতায় থাকি। আমার মনে হয় এই ঘরে বসে ওর সুস্থতার জন্য প্রার্থনা বিফল হবে না।

- - - - - - - - -

(** রচনাকাল – এপ্রিল, ১৯৯২)

মা আর সন্তান অভিন্ন। মায়ের দয়া-মায়া, স্নেহ-ভালোবাসা নিয়ত সন্তানকে ঘিরে সঞ্চারিত। তাঁর শুভাশীর্বাদ সতত সন্তানের শিরে হয় বর্ষিত – সিঞ্চিত। মাতৃস্বভাববশতঃ সর্বজীবের উপর তাঁর আশীর্বাদ নিত্য বর্ষিত হয়, আবার তিনি মুক্তির হেতু ব'লে প্রিয় ভক্ত ও সন্তানের উপর অহৈতুকী কৃপা সিঞ্চন করেন নিজ করে। তাঁর অমোঘ কল্যাণ কামনা তথা অব্যর্থ ইচ্ছা (Infallible longing), অভ্রান্ত অভীপ্সা (unerring desire), অনন্য ভাবনা তথা এক বা অসাধারণ চিন্তা (having no other thoughts), অনবদ্য (honourable) ন্যায়নিষ্ঠ (distinguished) প্রসিদ্ধ অতলস্পর্শী দরদী হৃদয় মাধুর্য, মরমী নয়নের দৃষ্টি কখনও সন্তানকে করে না প্রত্যাখ্যান। তাঁর সোহাগ মাখা কোল (affectionate lap) ও আদর ভরা বুক (Fondled breast) সর্বদা অবারিত ও প্রসারিত সন্তানের জন্য। সকল কালের, সকল দেশের, সকল জাতির, সকল সন্তানের ধ্যানে জ্ঞানে ধৃতি ও ধারণায় মা-ই আনন্দমূর্তি আলোর প্রতিমা। মা-ই সন্তানের অজ্ঞানাবরণ তামসান্ধকার দূর করে হৃদয় কন্দরকে ভরিয়ে তোলেন জ্ঞান বিজ্ঞান প্রজ্ঞানদ্যুতিতে; আবার তিনিই প্রদান করেন কর্মশক্তি জ্ঞানশক্তি যোগশক্তি প্রেমভক্তি ঐশ্বর্য-মাধুর্য ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ।

যুগে যুগে মায়েরই বিভিন্ন শক্তি প্রকৃতি [পরা ও অপরা এবং শক্তি – চামুণ্ডা ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী মাহেশ্বরী কৌমারী বারাহী নারসিংহী ও ঐন্দ্রী (চণ্ডী ৮ম অধ্যায়)] বিবিধ গতি ও বৃত্তি (শুক্ল ও কৃষ্ণ গতি, উর্দ্ধাদি নানা গতি, ও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বৃত্তি ভব ভাবনায় বার্তা চ সর্বজগতাং পরমার্তিহন্ত্রী - চঃ ৪/ ১০, বিশ্বপালনহেতু কৃষি গো-পালনাদি বৃত্তিস্বরূপা আপনি জগতের দুঃখ হারিণী] জগতের বেদনাকে হনন করে সন্তানদের চিরনবীন করে তুলেন, শান্তিপ্রদান করেন এবং অন্তিমে আপন ক্রোড়ে তুলে নেন। এই আলোকময়ী জ্ঞানমূর্তি হলেন সরস্বতী ভারতী বাগদেবী বা ইলা যিনি বেদমাতা ঋষি মুনি যোগিজন সেবিতা বন্দিতা, দেবদানব মানব অর্চিতা

পূজিতা নন্দিতা। স্বর্গলোকে তিনি ভারতী, অন্তরীক্ষে সরস্বতী, ভূলোকে তিনি ইলা[১] বা বাগদেবী। ভূর্ভুবঃ স্বঃ লোকে যে অগ্নিপ্রভা হিরণ্য দ্যুতি সূর্য জ্যোতিঃ বিদ্যমান সে সব তাঁরই অঙ্গরাগ অঙ্গজ্যোতিঃ –তিনিই জ্যোতিষ্মতী সরস্বতী বিদ্যাদেবী। সেই দেবী জ্যোতির প্রতিমা যাঁর জ্যোতির ছটায় বিশ্বভুবন আলোকিত জ্ঞানের দীপনে, সর্বান্তর জ্ঞানে আপূরিত, কর্মচাঞ্চল্যে সর্বহস্ত চরণ সঞ্চালিত, সর্বেন্দ্রিয় মন বুদ্ধি মেধা সেই দ্যুতিতে ঝলমল টলমল, সর্বত্র আলোর প্লাবন জ্যোতির জোয়ার দ্যুতির তরঙ্গ। জগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কণায় কণায় আকাশে বাতাসে আলোকে সলিলে ক্ষিতিতলে সেই আলোর স্পন্দন কম্পন বিচ্ছুরণ বিকীরণ। আবার সাধক অন্তরে যে আলোর দীপন উহাও সেই মহাজ্যোতির উদ্দীপন। সেই আলোকময়ী জ্যোতির্ময়ী মন্ত্রময়ী নাদময়ী সরস্বতী হলেন পুরাণের অষ্ট শক্তি – শ্রদ্ধা ঋদ্ধি কলা মেধা তুষ্টি পুষ্টি প্রভা ও মতি এবং তন্ত্রশাস্ত্রে তিনিই যোগা সত্যা বিমলা জ্ঞানা বুদ্ধি স্মৃতি মেধা প্রজ্ঞা। এই সরস্বতীই বিদ্যা সমস্তাস্তব দেবী ভেদাঃ স্ত্রিয়ঃ সমস্তা সকলা জগৎসু – (চণ্ডী-১১/৫)। তিনিই নির্বিকারা পরমা আদ্যাশক্তি – "অব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্তমাদ্যা"। চণ্ডী- ১০/৫-এ উক্ত "একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতিয়াকা মমা পরা" – এই জগতে আমি অদ্বিতীয়া, আমি ভিন্ন অপর কে আছে?

ইনিই আদ্যাশক্তি ব্রহ্মার মানস কন্যা সরস্বতী দেবী ভারতী যিনি সর্বশুভ্রা আলোক রূপিনী, যাঁর অন্তর্বহিরঙ্গ কেবল আলো আর আলো, "তরুণ শকল মিন্দোর্বিভ্রতি শুভ্রকান্তি" - চন্দ্রের নবীন কলার মতো যাঁর শুভ্রকান্তি যিনি "কুন্দেন্দু তুষারহারধবলা"- কুন্দফুলের মতো চাঁদ আর তুষারপুঞ্জের মতো শ্বেতবর্ণা, যিনি পরাদেবী পরমা জননী ও পরমা তটিনী অর্থাৎ তিনি একাধারে দেবী ও মাতা এবং নদীরূপা তথা উচ্ছল কলকল নাদিনী-তটিনী, সেই বিদ্যাদেবী জ্ঞানবতী ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার জননী যাঁর আরাধনার প্রকৃষ্ট সময় মাঘী শুক্লা পঞ্চমী।

ঋতুচক্রের আবর্তনে যখন শৈত্যের জড়তা ন্যূনতম, অন্ধতম রাতের দীর্ঘতা হ্রাস পায়, যখন কোকিলের কুহুতানে বিহগকুলের কলগুঞ্জরণে দিগন্ত মুখরিত, গাছে গাছে নবমঞ্জরী আন্দোলিত, কাননে কাননে সাদা সাদা লাল লাল ফুল প্রস্ফুটিত এবং সে সবের গন্ধামোদিত মৃদুমন্দ দখিনা বসন্ত পবনে ধরাতল শান্ত-সমাহিত আলোকে-আনন্দে, বিশ্ব প্রকৃতি নবরাগে রঞ্জিতা নবভাবে প্রভাবিতা, সেই শুভক্ষণে মহাভারতীর আবির্ভাব বিশ্ববাসীর পক্ষে এক চরম ও পরম মুহূর্ত। মায়ের অসীম করুণা ও কৃপা, অপার দয়া ও দাক্ষিণ্য জীবের আশাহত প্রাণে করে আশার সঞ্চার, অজ্ঞান চিত্তে ঢালে জ্ঞানের আলোক, আর ঠিক এই সময়ই হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের, মনের সাথে মনের, আত্মার সাথে আত্মার মিলন ঘটাবার অপূর্ব সুযোগ। **এই মিলন লগ্নে পার্থসারথিই আমাদের একমাত্র আশ্রয়, অনন্য সেতু যাঁর মাধ্যমে আমরা বিশ্ববাসীর সাথে বিশ্বপতির সাথে সম্মিলিত হতে পারব, যোগযুক্ত হতে পারবো।**

পার্থসারথি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একদা সমগ্র ভারতপ্রাণকে একসূত্রে গ্রথিত করতে চেয়েছিলেন। ফলতঃ তিনি পঞ্চপাণ্ডবদের বিশেষ করে শ্রী অর্জুনকে তাঁর লীলাখেলার সঙ্গী রূপে বরণ করেছিলেন। অর্জুন ও নিঃসংশয় হবার জন্য প্রশ্ন ও প্রার্থনা করেছিলেন, "যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম" (গীঃ ১১/৪)। হে যোগেশ্বর! তুমি আমাকে তোমার অব্যয় স্বরূপ দেখাও। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সেই বাসনা পূর্ণ করেছিলেন বিশ্বরূপ দেখিয়ে, এবং কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গনে জয়লাভ করেছিলেন কারণ যেখানে পার্থসারথি সেখানে জয় সুনিশ্চিত, আবার যেখানে যোগ সেখানে বিজয় অবশ্যম্ভাবি। **পাণ্ডবদের বিজয়ে ভারতের সনাতন ধর্মের বিন্যাস ঘটেছিল অবলীলাক্রমে, আর বর্তমানে এই "পার্থসারথির" বিজয় অভিযান সারা মানব জাতিকে ঘিরে, কেননা এই পত্রিকার মাধ্যমে যে সব লেখা প্রকাশিত হয় তাতে ভারতের বৈদিক ভাবধারা, সভ্যতা, সনাতন কর্মজ্ঞান, যোগপন্থা, আদর্শ শিক্ষা, কৃষ্টি সংস্কৃতি, বিশ্বজনমানসে প্রচারিত হচ্ছে, নিখিল মনের মণিকোঠায় অধ্যাত্ম ভাবের ছাপ পড়ছে, সুসংবেদন অনুভাবন ও অনুচিন্তন হচ্ছে জাগ্রত।** উচ্ছন্ন ও

দুঃশীল শিল্পকলা সাহিত্য পত্র পত্রিকার উপর প্রতিবন্ধকতার যে প্রবল চাপ সৃষ্টি করছে তাকে প্রতিহত করে **পার্থসারথি উন্নততর প্রগতির ভিত্তি স্থাপনে সহায় হবে, সেই সঙ্গে মানবের মানসিক জড়িমায় তমিস্রায় দৈন্য দুশ্চরিত্রতায় প্রচণ্ড আঘাত হেনে দুঃখ দুর্দশাকে পরাভূত করে নির্মল আনন্দ প্রদানের ব্যবস্থা করছে এবং করবে। আশাহত প্রাণে জাগাবে আশা, শোক-সন্তপ্তচিত্তে অসুস্থ দেহে ছড়াবে আরোগ্য, আনন্দ, আলোক, অশোক, এবং যোগাবে নবজীবনের আস্বাদ, সুখের সঙ্গীত – প্রজ্ঞান বিজ্ঞান দ্যুতি।**

প্রসঙ্গত – জীবনের সাথে জীবনযোগের - ভাবের সাথে ভাব মিলনের – হাতে হাত চলায় চলায় ছন্দ রাখার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে অসামান্য জীবনের, মহৎ প্রাণের উন্নত মনের পরিচায়ক – যা সম্ভব হয় ঐ দেবী সরস্বতীর যোগশক্তির প্রভাবে[২] যেহেতু তিনি যোগা এবং তিনি সত্যা বিমলা জ্ঞানা মেধা বুদ্ধি স্মৃতি ও প্রজ্ঞারূপে সংস্থিতা জ্যোতির প্রতিমা, তিনি বিদ্যাবীর্যবতী চৈতন্যরূপিণী দেবী শুক্লা সরস্বতী অনন্ত আলোক দ্যুতি ঋতম্ভরা চিদ্গতি নিত্যানন্দ নির্ঝরিণী শ্রীমতী ভারতী।

তাইতো সাধক-চিত্তে হয় ঐ দিব্যশক্তির আবেশ ঋষি মুনি যোগী ও অবতার পুরুষেরাও ঐ শক্তিবলে জগতের হিতসাধন করেছেন ও করছেন। ঐ শক্তিপ্রভাবে শ্রীঅরবিন্দ, বিবেকানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মহাপুরুষ বিশ্বের নমস্য হয়েছেন।

আজকের এই শুভ মুহূর্তে প্রার্থনা করি – মা-গো! আমাদের সকল অজ্ঞানতা দূর কর। প্রণাম জানাই – জননী ভারতীদেবীকে বেদ বেদান্ত বেদাঙ্গ বিদ্যাস্থান ও ভদ্রকালীকে –

ওঁ ভদ্রকাল্যৈ নমোনিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ।
বেদ বেদাঙ্গ বেদান্ত বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ।।

সেই সঙ্গে নমস্কার, শতকোটি নমস্কার –

পার্থসারথি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে ও তাঁর ভক্তদের চরণে –

নমো বাসুদেবায় কৃষ্ণায় বিশ্বাত্মরূপিনে।
যোগেশ্বরায় ভক্তায় পার্থসারথয়ে নমঃ ।। ১
যোগেশ্বর পরং ব্রহ্ম সত্যং জ্ঞানং পরং তপঃ।
পরা ভক্তিঃ ক্রিয়া শক্তিঃ যোগেশ্বর পরা গতিঃ।। ২
নমো বিজ্ঞানরূপায় সচ্চিদানন্দরূপিণে ।
কৃষ্ণায় গোপীনাথায় পার্থসারথয়ে নমঃ ।। ৩

১। ইলা সরস্বতী মহী তিস্রো দেবীর্ময়ভুবঃ। বর্হি সীদন্ত্বস্রিধঃ ।। ঋক ১/১৩/৯ । ইলা অর্থাৎ মাতৃসভ্যতা সরস্বতী মাতৃভাষা মহী মাতৃভূমি এই তিন দেবীই আমাদের কল্যাণদায়িনী।

২। বাংলার সাধক কবি গেয়েছেন – মাকে ভজো বাপকে পাবে।

"প্রয়াণকালে মনসা চলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক
স তং পরং পুরুষমুপৈতিদিব্যম্।।" (গীঃ ৮/১০)

অনুবাদঃ (শ্রীঅনিলবরণ)-

"তিনি মৃত্যুকালে অচঞ্চল মন, ভক্তি ও যোগবলের দ্বারা যুক্ত হইয়া এবং ভ্রূযুগলের মধ্যে প্রাণবায়ুকে সম্যকরূপে স্থাপন করিয়া সেই দিব্য পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হন।"

জীবনে আচরণীয় গীতার শিক্ষা **ভূমানন্দ**

অর্জ্জুন বলছেন, হে অচ্যুৎ! কৌরব ও পাণ্ডব এই উভয় সেনার মধ্যস্থলে আমার রথ স্থাপন কর। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে আমি নিরীক্ষণ করতে চাই কাহাদের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করতে হবে।

জীবন সংগ্রামে বিজয়ী হতে হলেও "উপায়ং চিন্তয়েৎ প্রাজ্ঞঃস্তোতথা অপায়ঞ্চ চিন্তয়েৎ"।

কর্ম্ম সফল করতে হলে সুদূর প্রসারী দৃষ্টি আবশ্যক। বিশ বছর পরে যে কাজ করতে হবে আজ হতে তাহার জন্য প্রস্তুতির কথা ভাবতে হবে এবং সুযোগ সুবিধামত একটু একটু করে প্রস্তুতির পথে অগ্রসর হতে হবে। এখন হতেই ভবিষ্যতের মধ্যে বাস না করলে "সমাপন্ন কালে" কর্ম্মকে সফলতা মণ্ডিত করা সম্ভব নাও হতে হতে পারে।

"কাল করে সো আজ কর।
আজ করে সো অব।"

কাল যা করবে তা আজই কর, আজ যা করবে তা এখনই। দীর্ঘসূত্রীর দুঃখের অবধি নাই!

গীতাতে শ্রীভগবান বলছেন অর্জ্জুনকে-

"ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোতিষ্ঠ পরন্তপ।"

এই ভগবদ্‌বাণী স্মরণ করে আমাদেরও কর্ত্তব্য আত্ম-পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করা আমরা ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্বল্য বশে কর্ত্তব্যবিমুখ হই কিনা।

গীতা বলেন পণ্ডিতগণ শোক করেন না। আমাদেরও কর্ত্তব্য যথাসম্ভব শোক না করা। আত্মবিৎ ব্যক্তি শোক অতিক্রম করেন। "তরতি শোকম্ আত্মবিৎ"।

শোককে যারা ধরে থাকে ত্যাগ করতে চায়না বা ত্যাগ করে না তাদের ধৃতিকে গীতা তামসী ধৃতি বলেছেন -

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।

ন বিমুঞ্চতি দুর্ম্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী।।

যারা কেবল ঘুমায়, যাদের ভয় দূর হয় না, বিষাদ ঘোচে না, গর্ব্ব লেগেই থাকে - তাঁদের গীতা বলেন তামসী ধৃতিসম্পন্ন।

যাহা গতাসু, যাহা মৃত, তাহার জন্য শোক করিয়া লাভ নাই। মৃত ব্যক্তির জন্য শোক করে তাকে ফিরে পাওয়া যায় না। তেমন নষ্ট বস্তুর জন্যও শোক করা বৃথা।

আমাদের ছাত্রজীবনে আমাদের এক মাষ্টার মহাশয় ক্লাসে তাঁহার হস্তস্থিত একখানা চকচকে বাঁধান নূতন বই দেখালেন এবং বললেন, "তোমাদের হাত থেকে এরূপ একখানা বই যদি কাদামাটির মধ্যে পড়ে যায় তাহলে তোমরা দুঃখিত হওনা?" "আজ্ঞে, হ্যাঁ।" "আমার কিন্তু দুঃখ হয় না। আমি জানি এমন হয়েই থাকে।" শুনেই বিস্মিত হলাম! তিনি সংসারী মানুষ, ছেলে মেয়ে নিয়ে ঘর সংসার করছেন, অথচ এরূপ 'অনাশক্তি' তিনি লাভ করেছেন।

গীতা বলেছেন - মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণ সুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়ি নো ই নিত্যা স্তাংতিতিক্ষস্বভারত।।

মাত্রা মানে ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়ের সহিত যখন বিষয়ের স্পর্শ ঘটে তখন শীত, উষ্ণ, সুখ দুঃখাদি উপস্থিত হয়, এগুলি আসে আর যায়, স্থায়ী হয় না, অতএব এগুলিকে সহ্য করবে, এতে বিচলিত হবে না।

একদিন এক গুরু তাঁর শিষ্যকে বলছেন, গীতায় আছে, "স্তাং স্তিতিক্ষস্ব ভারত", তা হলে তুমি পায়র হেটে না এসে রেল গাড়ীতে এলে কেন? শিষ্য উত্তর দিল - গীতা দুঃখ জন্মাতে বলেননি; জীবনে সুখ দুঃখ অনিবার্য্য; অনিবার্য্য দুঃখ সহন করাই গীতার অভিপ্রায়।" গুরু মৌন থেকে সম্মতি জানালেন।

এই সব অনিবার্য্য দুঃখ সহন করে কি লাভ? গীতা বলেন - এই সব দুঃখে যিনি ব্যথিত হন না; সুখেও যিনি বিচলিত হন না, তেমন ধীর ব্যক্তি অমৃতত্ত্ব লাভের যোগ্যতা লাভ করেন। "সমত্বং যোগ উচ্যতে"।

গীতা বলেন, কর্ম্মেই তোমার অধিকার, ফলে তোমার কোন অধিকার নেই। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" এই কথাটি যে কত সত্য তা ভেবে দেখা কর্ত্তব্য। কর্ম্মটি করা, না করা, সুচারুরূপে করা বা শুধু বেগার শোধ দেওয়ার মত যেমন তেমন করে কাজ করা কর্ম্মকর্ত্তার নিজের অধিকার, কিন্তু কর্ম্মের ফল তাহার নিজের আয়ত্তে থাকে না। ধর তুমি কৃষিকর্ম্ম করছ, হল কর্ষণাদি কর্ম্ম তোমার হাতে, কিন্তু ফসল হওয়া, না হওয়া, ভাল হওয়া, মন্দ হওয়া তোমার বশে নাই!

তবে, একথা মনে রাখা কর্তব্য যে ভালভাবে, সুচারুরূপে কাজ করলে সাধারণতঃ ভাল ফলই পাওয়া যায় - কিন্তু দৈব বশে অন্যথাও হতে পারে।

ভারতের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট রাধাকৃষ্ণন যখন আমেরিকায় গমন করেছিলেন, প্রেসিডেন্ট কেনেডি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করে নিতে এসেছিলেন; সে সময়ে বৃষ্টি হচ্ছিল; কেনেডি দুঃখ প্রকাশ করলেন; রাধাকৃষ্ণন বললেন, "প্রাকৃতিক অবস্থার উপর আমাদের অধিকার না থাকলেও, প্রাকৃতিক অবস্থা সানন্দে বরণ করা বা বিরক্তিসহকারে" গ্রহণ করার স্বাধীনতা আমাদের আছে।

মন নিজের মধ্যেই নিজে স্বর্গকেও নরকে পরিণত করতে পারে, আবার নরককেও স্বর্গে পরিণত করতে পারে। বস্তুতঃ অনাসক্তি না থাকলে জীবনে দুঃখের অবধি থাকে না। নিজের অভিপ্রায় মত জীবনে সব ঘটনা ঘটে না, ঘটতে পারে না। এমতাবস্থায় আসক্তি পোষণ করলে দুঃখের জ্বলন সহন করতে বাধ্য হতে হয়। শুনা যায় লোকে নিজের চুল নিজে উৎপাটন করে যখন আর কোন প্রতিকার থাকে না। ইহা অত্যাসক্তির ফল।

তাই গীতা বলছেন - কৃপণাঃ ফল হেতবঃ। যারা ফলাকাঙ্খী তাহারা দীন, তাহারা কৃপার পাত্র, তাহারা দুঃখ পায়।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেম শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লিখেছিলেন, 'জান দিলীপ, আমি কবে শান্তি লাভ করেছি? যেদিন আমি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছি – আমার ইচ্ছা অনুসারে কাজ না হলে কিছুই আসে যায় না। সেদিন থেকে আমি শান্তি পেয়েছি।'

বহুরূপী মৃত্যু **বীরেন্দ্র চন্দ্র সরকার**

ঈশ্বরতত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে দিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ বহুরূপীর উপমা। মৃত্যু সম্বন্ধেও বলা চলে সেই একই কথা। কবির কবিত্বের কথা ছেড়ে দিলেও শাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকেই কত বিচিত্রভাবেই না ভাবা হয়েছে - কত বিচিত্রভাবেই না দেখা হয়েছে এই মৃত্যুকে! মনে পড়ছে - আমার একটি পুরানো বন্ধু তার ছেলেবেলাকার খাতাপত্রের এক জায়গায় লিখে রেখেছিলেন Life begins in death. ছোটবেলার কথা হলেও, কথাটি কিন্তু মোটেই ছোট নয়। চারদিকে একবার চোখ মেলে চাইলেই, জন্ম মৃত্যুর কত বিচিত্র খেলাই চোখে এসে পড়ে! বীজ মরেই জন্মাচ্ছে বৃক্ষ, আবার বৃক্ষ মরবার আগে জন্ম দিয়ে যাচ্ছে বীজের। একদিক দিয়ে বীজ কারণ, বৃক্ষ কার্য; অন্যদিকে বৃক্ষই কারণ, বীজ কার্য। কোন কোন কীটপতঙ্গের বেলায়ও দেখা যায় মায়ের দেহ নিঃশেষ করেই সন্তান করে জন্মলাভ। তবে, উদ্ভিদ অথবা এই সব কীট পতঙ্গের বেলায় জন্মমৃত্যু আসে যত নিঃশব্দে - যত সহজ ও স্বাভাবিকভাবে, মানুষের ক্ষেত্রে কিন্তু ঘটেনা তেমনটি। মানুষ মননশীল জীব। বিশ্বপ্রকৃতি থেকে বেশীর ভাগ রসই সংগ্রহ করে সে মন দিয়ে। শরীর অপটু হলেও, মন বিরস হতে চায় না। কাজেই শরীর আর মনে লড়াই করে, যতদিন পারে চায় সে টিঁকে থাকতে। যে সব পার্থিব বস্তু থেকে রস নিয়ে নিয়ে থাকে সে বেঁচে, তাদেরও স্থায়ীত্ব কামনা করে সে। তাই উদ্ভিদাদির পক্ষে যা সহজ মৃত্যু, মানুষের ক্ষেত্রে তা কঠিন নিয়তি! করুণ পরিণতি!

(২)

কিন্তু সহজই হোক আর কঠিনই হোক, মানুষকেও ত হবেই একদিন মরতে, তাই একশ্রেণীর লোক, গাছের শিকড় কেটে দিলে যেমন ফুরিয়ে যায় ওর

রস নেবার শক্তি, তেমনি করে, আগে-আগেই বিষয়বস্তু থেকে মনকে সরিয়ে নিয়ে হতে থাকেন মরণের জন্য প্রস্তুত। "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ"। জন্মালে যখন মরতেই হবে, তখন আগে থাকতেই প্রস্তুত হয়ে থাকাই ত বুদ্ধিমানের কাজ! "প্রসাদ বলে দুর্গা বলে যাত্রা করে আছি বসে।"

আবার কেউ কেউ এ বলেও মনকে প্রবোধ দেন "ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।" ভয়ই বা কি? জন্মালেই যেমন হয় মরতে, তেমনি মৃত ব্যক্তির পুনর্জন্মও ত ধ্রুব সত্য। দিন কয়েকের জন্য দেশ ছেড়ে বিদেশ যাওয়া বই ত নয়! এ আর এমন কি একটা কথা!

আরও একটু এগিয়ে এসে কেউ আবার বললেন-আসল ব্যাপারটা যে কী তা একটু ভেবে দেখ দেখি!

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরানি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।।

ছেঁড়া কাপড়খানা ছুড়ে ফেলে দিয়ে যেমন করে আর একখানা নতুন কাপড় পরে নেওয়া, ঠিক তেমনি করেই ত একটা পচা পুরানো দেহ ছেড়ে দিয়ে নতুন একটা দেহে চলে যাওয়া! এছাড়া মৃত্যু আর কি? একে এত বড় করে দেখে মিছিমিছি কষ্ট পাওয়া কেন?

আবারও একদিন দিয়ে বলা হয় - "অব্যক্তাদীনিভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কাপরিবেদনা।" দেখ, জন্মের আগে তুমি কি ছিলে, কোথায় ছিলে, কেমন ছিলে, সে সব কিছুই ত তুমি জান না। আবার, মৃত্যুর পরেও তুমি কি হবে, কোথায় যাবে, কেমন থাকবে তাও তোমার নেই কিছু জানা। জন্মমৃত্যুর মাঝখানের এই গোটাকয়েক দিনেরই যা কিছু জানাজানি! এতে আর এসে যায় কি? এরজন্য এত মাথাব্যথাই বা কেন?

এমনি করেই, যুগ যুগ ধরে জন্মমৃত্যুর কত কথাই না শোনান হয়েছে মৃত্যুকাতর মানুষের কানে, তার মৃত্যুভয় নিবারণের আশায় - কৌতূহল মেটাবার চেষ্টায়।

(৩)

দেখা যায়, মানুষের মধ্যে আছে সুর ও অসুর দুইই। আর নিত্য কাল ধরেই চলেছে এই সুর ও অসুরে মিলে মৃত্যুসাগর মন্থন! এর ফলে, কখনও উঠে বিষ!

মৃত্যু যখন অনিবার্য, তখন যেমন করেই পার আর যতটা পার, সময় থাকতে করে নাও চুটিয়ে ভোগবিলাস! অত পরিণামের কথা ভেবে ভেবে মন খারাপ করার দরকারটা কি? "যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ। ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।" ক্বচিৎ কখনও ওঠে অমৃত! অন্তর থেকে প্রার্থনা জাগে – অসতোমা সদ্গময়ো, তমসোমা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মাঅমৃতংগময়ো – নিয়ে চল আমাকে অসৎ থেকে সৎ-এ, অন্ধকার থেকে আলোকে, মৃত্যু থেকে অমৃতে! কিন্তু কি করে হবে সেটা সম্ভব? অনেক সাধ্য সাধনা করে শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেলেন শাস্ত্রকারেরা এর একটা সমাধানের পথ। বললেন তাঁরা - যদি সত্যি সত্যিই এ চাও, তবে আশ্রয় কর ভগবানকে। ভগবান? কি তাঁর নাম? কেমন তাঁর রূপ? দেখা যায়, বেদ বেদান্ত থেকে সুরু করে সকল তন্ত্র-পুরাণেই দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এর উত্তর - ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায়। কিন্তু, সকল বাদ-বিসম্বাদ সত্ত্বেও, সকলেই মোটামুটি একমত - ভগবান সচ্চিদানন্দ - সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ। কাজেই, কোনরকমে তাঁর সাথে যুক্ত হতে পারলেই ত যাওয়া হল - অসৎ থেকে সৎ-এ, অন্ধকার থেকে - অজ্ঞান থেকে জ্যোতি অথবা চিৎ-এ, মৃত্যু অথবা মৃত্যুভয় থেকে অমৃতে অর্থাৎ আনন্দে। মৃত্যু এড়াবার এই তো কৌশল! "যোগঃ কর্মসু কৌশলম্।"

(৪)

কিন্তু, বলাটা যত সহজ, করাটা তো তত সহজ নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় – তবলার বোল মুখে বলা সহজ, কিন্তু হাতে উঠান কঠিন। তা' যত কঠিনই হোক না কেন কাজটা, মৃত্যুকে তো আর বলতে পারা যায় না বসে থাকতে! তাই দেখা

যায়, এই মৃত্যু অথবা মৃত্যুভয় থেকেই সুরু হল সকল ধর্মকর্মের। তবে, আরম্ভে দেখা যায় মৃত্যুর যে ভাবমূর্তি - ঘটে গেছে পরে পরে তার বহু ভাবান্তর।

প্রথম দেখা যায় মৃত্যুকে, মৃত্যু দেবতা যমের বেশে - মাথায় রাজমুকুট, হাতে রাজদণ্ড, মহিষবাহন, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। বাস করেন তিনি ভয়ের পুরী – যমপুরীতে, করেন ধর্মাধর্মের সূক্ষ্ম-বিচার আর সেই অনুসারে দণ্ড অথবা পুরস্কারের ব্যবস্থা। সকল কর্ম্মফলদাতা তিনিই। ভুক্তিমুক্তির সকল ভারও তারই উপরে। এই মৃত্যুরূপী যমকেই খুশি করে উপনিষদের যুগে লাভ করতে হয়েছিল নচিকেতাকে আত্মজ্ঞান, আর সাবিত্রীকে মৃত পতির পুনর্জীবন। ত্রিভুবনে ছিলনা এমন কেউ-ই যে যমকে ভয় না করে পারত।

এরপর যুগ পরিবর্তনে ঘটে গেল ভাবের পরিবর্তন, আর সেই সাথে সাথে মৃত্যুরও রূপ পরিবর্তন। রইলেন না আর মৃত্যুদেবতা যম, - মৃত্যুরাজ্যের একছত্র অধীশ্বর, ধর্মরাজ্যেরও নয়। পড়ল এখন জন্মমৃত্যুর – ভুক্তিমুক্তির চাবিকাঠি ঈশ্বরাবতারগণের হাতে। প্রাক্-নরলীলায়ও আছে নৃসিংহ অবতারের কথা। অর্ধেক নর, অর্ধেক সিংহ - সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপে আবির্ভাব। নিহত হলেন দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু – ত্রিভুবন হল ভয়ে কম্পমান। বালক প্রহ্লাদ কিন্তু পেল না কোন ভয় – চিনে ফেলল মৃত্যুরূপধারী নরসিংহকে – স্তব-স্তুতি করে করল তাঁকে খুশি – লাভ করল অভয়পদ।

এরপর আরও কত কত বেশে, কত কত ভাবেই না মিলেছে মৃত্যুর দর্শন! ভগবদ্গীতার কথাই ধরা যাক। নবম অধ্যায়ের উনিশ শ্লোকে বলা হয়েছে-

তপাম্যর্হমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।

অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন।।

আমিই অমৃত, আমিই মৃত্যু; আমি সৎ, অসৎও আমিই। এ শুধু কৃষ্ণাবতারেরই কথা নয়; সকল অবতারেরই এই একই কথা। কেবল পুরাণের কথাই এ নয়; সকল তন্ত্রের কথাও এই-ই।

যাহোক, এসবের ফলে ভাব-জগতে ঘটল এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। যে মৃত্যুর ভয়ে মানুষ ছিল এতদিন সদা শঙ্কিত, যা চিরদিন ধরে হয়ে এসেছে মানুষের কাছে "ভীষণং ভীষণানাম্" - যাকে এড়াবার জন্যই এতকাল ধরে করে এসেছে মানুষ যা কিছু ধর্ম্মকর্ম্ম, তাকেই – সেই মৃত্যুকেই – কিনা ভাবতে হবে এখন এক করে নিজ ইষ্টের সাথে! ধ্রুবের "পদ্মপলাশলোচন" কেই দেখতে হবে প্রহ্লাদের 'নৃসিংহ-মুরারী'রূপে! শুধু ভাবতে হবে বা দেখতে হবে নয়, ভালও বাসতে হবে তাঁকে - নিজ গুরু-নিজ ইষ্ট বলে। গুরুকেও যে স্তব করা হয় – "গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ" বলে, একদিক দিয়ে তারও তো এই একই অর্থ! কেউ কেউ আবার এতেও পুরোপুরি খুশি হতে না পেরে, একমাত্র সংহারমূর্তি শিবকেই করলেন তাঁদের পরমেষ্ট যথাসর্বস্ব! কেউ বা আরও একটু এগিয়ে গিয়ে মাতৃরূপিনী কালীকেই ভাবতে শুরু করলেন বরাভয়দায়িনী মাতৃরূপে। জন্মের আদিতে যে মা, মৃত্যুশিয়রেও তো সেই মা'ই। মৃত্যু মানে তো সেই মায়ের কোলেই ফিরে যাওয়া! তা'ছাড়া আর কি? একথা বলতে গিয়ে মনে আসে স্বামী বিবেকানন্দের 'মৃত্যুরূপা মাতা' কে-

"সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।"

এরপরও, সহজ প্রেমের সাধক সহজিয়া বৈষ্ণবদের আরও একগ্রাম সুর চড়িয়ে বলতে শোনা যায় - "মরণরে তুহুঁ মম শ্যাম সমান।" এ কথার পরে বুঝি আর নেই কোন ভাব নেই কোন ভাষা!

"বিষয় কর্ম করলেই অশান্তি হয়, অনেক ভাবনা চিন্তা জোটে। যতক্ষণ সঙ্গে বাসনা থাকে ততক্ষণ কর্ম থাকে, আর কর্মের দরুণ ভাবনা, চিন্তা, অশান্তি। বাসনা বাসনা ত্যাগ হলেই কর্মক্ষয় হয় আর শান্তি হয়।"

------ শ্রীরামকৃষ্ণদেব

মন চলে হিমাচলে **শ্রী অরূপ কুমার ভট্টাচার্য্য**

২০০৩ সালের ১২ মার্চ। সকাল থেকেই আকাশ বলছিল ঝামেলা পাকাবে। কালো মেঘের আড়াল থেকে বিদ্যুতবাণ অথবা তার বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়াকে তেমন পাত্তা না দিলেও চলতো কিন্তু প্রচণ্ড ঝড়ে রেলরাস্তার হাল কি হবে সেই চিন্তাই সেদিন আমাদের ঘুম কেড়েছিল। স্বাভাবিক - সেদিন রাতের কালকা মেলের মতিগতির ওপরেই যে আমাদের আগামী ১৭ দিন হিমাচল ভ্রমণের ভবিষ্যৎ। বৃষ্টি কখনো ঝরছে কখনো ধরছে, তার সাথে 'ও কুমীর তোর জলকে নেমেছি' খেলতে খেলতে শুকনো গায়েই সেদিন হাওড়া স্টেশনে পৌঁছেছিলাম সময়ের প্রায় ঘণ্টা তিনেক আগে। তারপরেই যে বৃষ্টিটা শুরু হল তাতে জলের তীব্রতার সাথে বুক ধুক পুকানিও বড় কম ছিল না। একের পর এক ট্রেন বাতিল হচ্ছিল ঝড় বৃষ্টির সাথে লড়াই করার ভরসা না পেয়ে। তবে আগে পরে অনেক ট্রেনের চাকা না গড়ালেও হাওড়া কালকা মেল ছাড়লো একদম সঠিক সময়ে। এখনকার ১২৩১১ কালকা মেলের হাওড়া ছাড়ার সময় ২১.৫৫ হলেও ২১ বছর আগে সম্ভবত সে ছাড়তো ১৯টা ৪০ মিনিটে। ওল্ড দিল্লীতে খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে তখন কালকা পৌঁছাতে ৩২ ঘণ্টারও বেশি সময় লেগে যেত। তবে শেষ পর্যন্ত আমরা আর কালকায় পৌঁছালাম কোথায়? ১৯০৬ সালের কালকা সিমলা ন্যারোগেজ ট্রেনের স্বপ্ন আকাশে উড়িয়ে প্রায় শেষ রাতে আমরা নেমে গেলাম চণ্ডীগড়ে – কালকার এক স্টেশন আগেই। চণ্ডীগড়ে আমাদের নামিয়েছিল প্রধানতঃ নেকচাঁদ সাহনির রক গার্ডেনের জন্য, অবশ্য লাগোয়া শুকনা লেকের আকর্ষণও ছিল বৈকি! ১৯৫৮ থেকে ১৯৭৬-এ ১০ হেক্টর জমিতে গড়ে ওঠা উদ্ভট যাদুপুরী রকগার্ডেনের মুক্তাঙ্গন থিয়েটার, মিউজিয়াম, কৃত্রিম জলপ্রপাত, দরবার হল আর প্যাভিলিয়ন দেখতে খুব বেশি সময় যে দিতে পারিনি তার একটা কারণ চণ্ডীগড় থেকে সিমলার বাস ধরার তাড়া। তবে ১১৭ কিলোমিটার দূরে ২২১৩ মিটার উচ্চতার হিমাচল রাজধানীর পথটা যতই সুন্দর হোক না কেন, শিবালিক পাহাড় পেঁচিয়ে ৯৬ কিলোমিটার কালকা সিমলা ট্রেন

পথের কাছে সে দশ গোলে হারবে। ১০৩টি টানেল, ৯৬৯ সেতু আর ২০টি স্টেশন ছুঁয়ে চলার ইচ্ছেটা মনের মধ্যে লুকিয়ে রেখে ঘণ্টা চারেকের দৌড় শেষে বাস যেখানে নামিয়ে দিল সেখান থেকে স্ক্যান্ডাল পয়েন্টের 'হোটেল গোল্ড' পৌঁছাতে কিছুটা চড়াই ভাঙতে হয়। গাড়ি ঘোড়ার প্রশ্নই নেই কারণ পরবর্তীকালে সিমলা ম্যালের ওপর ইন্দিরা গান্ধী, নেহেরু অথবা গান্ধী মূর্তি দেখার সময় বুঝেছি ম্যালে গাড়ি চলেনা, সবই দেখতে হয় পায়ে পায়ে। পায়ে হেঁটেই দেখেছিলাম বাঙ্গালিস্থান কালীমন্দির। তারপর ধৌলাধার পর্বতের শোভা দেখতে দেখতে ম্যালের অপর প্রান্তে উত্তর ভারতের দ্বিতীয় প্রাচীন চার্চ- অ্যাঙ্গলিসিয়ান ক্রাইস্ট চার্চ। ম্যালের বেঞ্চে বসে সূর্যের তাপে শরীর সেঁকতে চলে আসতো স্টেট ব্যাঙ্কের বাবুরাও অবশ্যই টিফিন টাইমে। তাদের কাছেই শুনলাম কোথা থেকে অপহৃত হয়েছিলেন তৎকালীন ভাইসরয়ের কন্যা, যার জন্য এলাকাটার নামই হয়ে গেছে 'স্ক্যান্ডাল পয়েন্ট'। পরদিন একটা জিপ ভাড়া করে ১৬কিলোমিটার দূরে 'কুফরী' যাওয়ার পথে ২৫৯৩ মিটার উচ্চতায় 'ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার হল' আমাদের থামিয়ে দিল তার অপরূপ রূপের মোহে ভুলিয়ে দিয়ে। চেনা অচেনা পাহাড়ি ফুল আর পাইনে ছাওয়া এই জায়গায় মন ভোলায় নাম না জানা পাখির গান আর চোখ জুড়ায় শ্রীখন্ড পাহাড়, বদরীনাথ আর পীরপাঞ্জাল পর্বত শ্রেণী। এখান থেকে পরের তিন কিলোমিটার পথে কুফরী পর্যন্ত বরফ আমাদের সঙ্গ নিল।অবশেষে পৌঁছে গেলাম ২৬৩৩ মিটার উচ্চতায় দেওদারে ছাওয়া পটে আঁকা ছবি কুফরীতে। পীরপাঞ্জাল, বদরীনাথের সাথে কেদারনাথ, শিবালিক শিখর শ্রেণীও সুন্দর দৃশ্যমান এখান থেকে। নয়নাভিরাম প্রকৃতির মাঝখানে অতীতের চিনি বাংলোয় সম্ভবতঃ সিমলা চুক্তির বৈঠক বসেছিল ইন্দিরা গান্ধী ও জুলফিকার আলি ভুট্টোর মধ্যে, যে চুক্তি শেষ পর্যন্ত সাক্ষরিত হয় বার্নেস কোর্টে (রাজভবন, সিমলা)-২রা জুলাই, ১৯৭২। কুফরীকে আমরা আরো চিনি গুপীগাইন বাঘাবাইন সিনেমার জন্য। শুন্ডি যেতে চেয়ে গুপী বাঘা যে বরফের রাজ্যে এসে পড়েছিল সে দৃশ্য নেওয়া হয়েছিল এই কুফরীতেই। ঘোড়ায় চেপে উৎসাহীরা এখান থেকে ৬ কিলোমিটার দূরের 'ফাগু' ও ঘুরে আসতে পারেন। ২৫১০ মিটার

উচ্চতার অশ্বজিনরূপী ফাগুর প্রশস্তি শুধু নৈসর্গিক শোভার জন্য নয়, আলু নিয়ে গবেষণাও চলছে এখানে। সিমলার ম্যালেই পরিচয় হয়েছিল এমন কয়েকজন কার ড্রাইভারের সাথে যারা পুরো হিমাচল প্রদেশকে চেনে একেবারে হাতের তালুর মত। স্বাভাবিক, এটাইতো ওদের পেশা। তবে যতই চেনা পরিচিত হোক না কেন দর দস্তুর না করে কখনোই গাড়ি নেওয়া উচিৎ নয়, বিশেষ করে অফ সিজনে। কস্ট-বেনিফিট হিসেব করে কিন্নরের ছেলে মোহিতকে বেশ পছন্দ হয়ে গেল প্রধানত তার হাসি খুশি স্বভাবের জন্য। তাছাড়া পয়সার ব্যাপারটাই বা অস্বীকার করি কি করে! সেই মত পরদিন সাত সকালে হোটেল গোল্ডে এত্তেলা পেয়ে সিমলা বাস স্ট্যান্ডে নেমে আসতেই দেখি মোহিত প্রস্তুত তার মারুতি ওমনি নিয়ে। ব্যাস শুরু হয়ে গেল আমাদের যাত্রা উত্তরের পথে। কখনো বিপাশাকে সঙ্গে নিয়ে আবার কখনো বা সরষের ক্ষেতকে পাশে রেখে পথ চলতে চলতে প্রায় ১৮৫ কিলোমিটার পার হয়ে 'ভ্যালি অফ গডস'- কুলু উপত্যকা। পাহাড় পর্বতে ঘেরা ৭৬০ থেকে ৩৯১৫ মিটার উচ্চতায় ৮০ x ২ কিলোমিটার এই উপত্যকা দিয়ে বয়ে চলেছে শতদ্রু, বিয়াস, সেহু,তীর্থন, পার্বতী, সরোবরী, চন্দ্র আর ভাগার মত সব পাহাড়ি নদী। বিপাশার পার ধরে মান্ডী থেকে রোটাং পর্যন্ত ব্যাপ্ত এই উপত্যকার মধ্যমণি অবশ্যই কুলু শহর। তবে বেদব্যাস, বশিষ্ঠ, গৌতম, জমদগ্নি, মনুর মত মুনি ঋষিদের বাসস্থান হওয়া সত্ত্বেও পর্যটন মানচিত্রে কুলুর স্থান উপত্যকার অন্য শহর মানালীর অনেক পিছনে। ১২১৯ মিটার উচ্চতার ১২ x ৩ কিলোমিটার ব্যপ্ত শহরে আমরা রাত কাটাইনি। 'সামসি'তে শাল তৈরী হওয়া দেখে ভ্রমণের স্মারক হিসেবে কুলুর টুপি কিনে এগিয়ে চলি আরো চল্লিশ কিলোমিটার উত্তরের শহর মানালিতে। হোটেলের নাম এখনো মনে আছে - 'শান্তিনিকেতন' । বাঙালীর রসনাকে তৃপ্ত করতে তখন এ হোটেলের জুড়ি ছিল না। তবে থাকার ব্যবস্থা নিতান্তই মোটামুটি, বরং পায়ে পায়ে মানালী ঘোরার সময় বিপাশা পেরিয়ে 'বিয়াস ভিউ' এর মত হোটেল আমাদের মন টেনেছিল বেশি। এরপর কুড়ি বছর পর আবার মানালিতে এসে ম্যালের কাছাকাছি যে 'নিউ কেনেলওয়ার্থ ইন্টারন্যাশনালে' ছিলাম দামে আর

মানে সেটা সব অর্থেই আধুনিক। মানালীতে দ্রষ্টব্য যা কিছু কুড়ি বছরে খুব একটা বদলায়নি। বশিষ্ঠ বাথ, ক্লাব হাউস অথবা হিড়িম্বা মন্দির প্রায় একই রকম আছে, তফাৎ হয়েছে শুধু মানুষের ভিড়ে। যে মন্দিরের শান্ত নির্জন পরিবেশ আগে মহাভারতের কালে নিয়ে ফেলতো, লম্বা লাইনের ঠেলায় আজ সে মন্দিরে ঢুকতে পাওয়াই দুস্কর। তাছাড়া র‍্যাফটিং, প্যারাগ্লাইডিং অথবা রিভার ক্রশিং নিয়ে ১২ কিলোমিটার দূরের সোলাং ভ্যালি আজ জমজমাট ট্যুরিস্ট স্পট। কুড়ি বছর আগে সেখানে গেছিলাম ২৪ ফুট স্বয়ম্ভু তুষার লিঙ্গ দেখতে। সবচেয়ে বড় পরিবর্তন সম্ভবতঃ ঘটেছে রোটাং পাসে। কেলং থেকে মানালী আসার সময় ৯ কিলোমিটার অটল টানেলের কল্যাণে যে রোটাং আমাদের চোখের আড়ালে রয়ে গেল, ২০০৩-এ বিয়াসের অন্যতম উৎসস্থল সেই রোটাং পাসই ছিল হিমাচল ভ্রমণের সেরা আকর্ষণ। কোটি পার হয়ে বরফের সমুদ্রে নামতে ভাড়া করতে হয়েছিল ওভারকোট, গামবুট আর টুপি সহ বরফ রাজ্যের উপযুক্ত পোষাক। স্কিয়িং অথবা স্কেটিং নয়, তবে ঐ জাতীয় খেলায় মাততে দেখেছিলাম আডভেঞ্চার প্রিয় তরুণ তরুণীদের। আমাদের আনন্দ শতগুণে বাড়িয়েছিল বরফের বৃষ্টি। সেই প্রথম জেনেছিলাম তুষারপাতের কোন আওয়াজ নেই, শুধু ওভারকোট, টুপি আর গ্লাভস ক্রমশঃ সাদা ফোঁটায় ভরে ওঠে।

মানালীর স্মৃতিতে অবশ্যই থাকবে ১৮ই মার্চ, মঙ্গলবার। মোহিত গতকালই জানিয়েছিল আজ হিমাচলে গাড়ির চাকা চলবে না হোলি উৎসবের কারণে। একটা দিন বিলকুল বরবাদ বলে মন খারাপের যে মেঘটা সবে জমতে শুরু করেছিল, তাকে দুরন্ত বাতাসে উড়িয়ে দিল ঐ হোলি উৎসবই। হোটেলের সামনে হোলিগানের সুর শুনে নেমে আসতেই দেখলাম রঙ্গিন হিমাচলীদের নাচ গান। ফাগের আগুনের তাপ যে কম্বলের উত্তাপের চেয়ে অনেক বেশি তাই বুঝে আমরাও সামিল হয়ে যাই তরুণ তরুণীদের হোলি উৎসবে। ঠাণ্ডা তখন বিপাশা পেরিয়ে কেলং হয়ে লাদাখে পালিয়েছে - আমাদের নষ্ট হওয়া দিনটাকে ভরে দিয়ে গেছে উৎসবের আনন্দে।

উত্তর থেকে এবার দক্ষিণে চলার পালা। সেই পথে মোটামুটি আড়াই ঘন্টায় ১০৮ কিলোমিটার পার হয়ে সুন্দর এক পাহাড়ি শহর 'মাণ্ডী'। শিবালিক পাহাড়ের ৮০০ মিটার উঁচুতে বিপাশার দক্ষিণ পাড়ের এই শহরের পত্তন হয়েছিল ১৫২০ সালে রাজপুতদের হাতে। মানালী তথা কুলু উপত্যকার প্রবেশদ্বারও এই 'মাণ্ডী'। পাঠানকোট অথবা চণ্ডীগড় থেকে মানালীর পথ এইখানে যেন দক্ষিণের সমতল কে উত্তরের পাহাড়ের সাথে মিলিয়ে দিয়েছে। হিমাচলের পূব থেকে পশ্চিম অথবা উত্তর থেকে দক্ষিণের প্রতিটি বাসই যায় রাজ্যের মধ্যমণি 'মাণ্ডী'কে স্পর্শ করে। তবে সাত সরোবরের দেশ এই 'মাণ্ডী'র সেরা আকর্ষণ ২৪ কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্বে ১৩৬০ মিটার উচ্চতায় হিন্দু বৌদ্ধ শিখ তীর্থ 'রিওয়ালসর' লেক।। বর্গাকার লেকের চারপাশ সবুজ পাহাড় আর বনের মেলামেশা দিয়ে ঘেরা। রঙ বেরঙ্গের লুংদার বা বৌদ্ধদের প্রার্থনা পতাকা উড়ছে যে জলাশয় ঘিরে, তারই জলে ছোট বড় লালচে মাছের খলবলানিতে চোখ আটকে যায়। পুরাণ বলে নদী জলে পুষ্ট লেকে ষষ্ঠ শতকে তপস্যা করেন লোমশ ঋষি। অষ্টম শতকে তান্ত্রিক পদ্মসম্ভবাও বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারে তিব্বত রওনা হন এখান থেকে। স্মারকরূপে যে মনাষ্ট্রি, সেখানে রয়েছে গুরু রিমপোচে তথা পদ্মসম্ভবার পদচিহ্ন। প্রতি ১২ বছর অন্তর মার্চ এপ্রিলে যে TSO-PEMA উৎসব হয় ২০০৩-এ সেটা দেখা সম্ভব ছিল না কারণ ১৯৯২ এর পর আবার সে আসর বসেছিল যথাক্রমে ২০০৪ আর ২০১৬ সালে।

'মাণ্ডী' থেকে মোটামুটি ১২৬ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে দলাইলামার বর্তমান আশ্রয়স্থল ধরমশালা। পথেই দেখা হয়ে যায় মনোরম পাহাড়ি পরিবেশে ৭০০ বছরের প্রাচীন চামুণ্ডা দেবীর মন্দির। জাগ্রতা দেবী চামুণ্ডার মন্দিরের পিছনেই নন্দীকেশ্বর শিবের গুহা আর ঝর্ণা। যে চণ্ড আর মুণ্ডকে জয় করে দেবী হয়েছিলেন চামুণ্ডা সেই বধ্যভূমিও রয়েছে ১৬ কিলোমিটার দূরে ধৌলাধার পাহাড়ে। তবে পায়ে পায়ে এতটা পথ এখন তো অসম্ভব – তখনো সম্ভব হয়নি। আর রয়েছে ১৩৬০ মিটার উচ্চতায় ছোট্ট শহর 'বৈজনাথ'। দূরে ধৌলাধার, সামনে আশাপুরী রেঞ্জ আর নীচ দিয়ে বয়ে যাওয়া বিনোয়া নদী – চাইলে এখানেও কাটিয়ে দেওয়া যায় দু'তিনটে

নিশ্চিন্ত দিন। আমরা অবশ্য এখানে রাত কাটাইনি। ৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের বৈদ্যনাথ শিব তথা বৈজনাথ দেখে এগিয়ে চলি ধরমশালায় একটা রাতের আশ্রয় খুঁজে নিতে।

কলকাতা থেকে সরাসরি ধরমশালায় আসতে নিকটতম রেলস্টেশন পাঠানকোট প্রায় ৯২ কিলোমিটার আর বিমানে এলে নামতে হবে ১৯২ কিলোমিটার দূরের অমৃতসরে। পাঠানকোট থেকে মূহুর্মূহু ছাড়া বাসে বাসে সাড়ে তিন ঘন্টায় ধরমশালায় পৌঁছনোই যায়, তারপর সেখান থেকে উত্তর পূর্বে চাম্বা-খাজিয়ার-ডালহৌসি দেখবেন নাকি আমাদের ফেলে আসা পথ ধরে সিমলা ছুটবেন সে সিদ্ধান্ত একান্তই আপনার।

তিনদিকে ধৌলাধার আর সামনে ধাপে ধাপে নেমে আসা কাংড়া উপত্যকায় দেওদার, ওক আর পাইনে ছাওয়া স্নিগ্ধ পাহাড়ি শহর ধরমশালা। ১৮৫৫ তে শহরের পত্তন হয় কাংড়ার রাজা ধরমচাঁদের নামে। বর্তমানে দশ কিলোমিটারের ব্যবধানে দু'ভাগে গড়ে উঠেছে আপার আর লোয়ার ধরমশালা। ১২৫০ মিটার উচ্চতার লোয়ার ধরমশালার প্রাণকেন্দ্র কোতোয়ালি বাজার। সেখানেই বাসস্ট্যান্ড আর ট্যুরিস্ট অফিস। থাকার পক্ষে HPTDC'র হোটেল ধৌলাধার যথেষ্ট ভালো। কাছেই কাংড়া আর্ট মিউজিয়ম, যেখানে মিনিয়েচার ধর্মী কাংড়া পেন্টিং ছাড়াও দেখা যায় পাঁচশতকের কাংড়া ভাস্কর্য আর পুরাতত্ত্বের অমূল্য সম্ভার। বাজার থেকে তিন কিলোমিটারের মধ্যেই রয়েছে চীন ও পাকিস্থান যুদ্ধে শহীদদের ওয়ার মেমোরিয়াল। আপার ধরমশালা আবার দু'ভাগ হয়েছে ম্যাকলয়েডগঞ্জ আর ফরসিথগঞ্জে। ১৯৫৯'র অক্টোবরে চীন তিব্বত দখল করলে ১৪ তম দলাইলামা লাসা থেকে পালিয়ে এসে তাঁর মিশন উপনিবেশ তথা GELUGPA মনাষ্ট্রি গড়েন ম্যাকলয়েডগঞ্জে। এখানে রয়েছে ন'ফুট উঁচু বুদ্ধ, পদ্মসম্ভবা আর অবলোকিতেশ্বর তথা বোধিসত্ত্বের মূর্তি। প্রতি বিকেলে এখানে প্রেয়ার ও ধর্মীয় ডিবেটের আসর বসে, নেওয়া হয় ধ্যানমূলক ক্লাস। শুনলাম স্বয়ং দলাইলামাও এই ধ্যান ক্লাসে অংশ গ্রহণ করেন। আমাদের দুর্ভাগ্য যে সেই সময় দলাইলামা ধরমশালায় ছিলেন না, তা সত্ত্বেও তার

কটেজধর্মী বাস ভবনের সামনে যে ভিড় দেখেছি তাতে অবাক হতে হয়। স্বয়ং বুদ্ধদেবকে মনে মনে স্মরণ করে ফিরে চলি লোয়ার ধর্মশালার হোটেল ধৌলাধারে। আগামীকাল মোহিতের মারুতি আমাদের নিয়ে ছুটবে চাম্বা উপত্যকার ডালহৌসি পাহাড়ের দিকে।

সিমলা ম্যাল থেকে

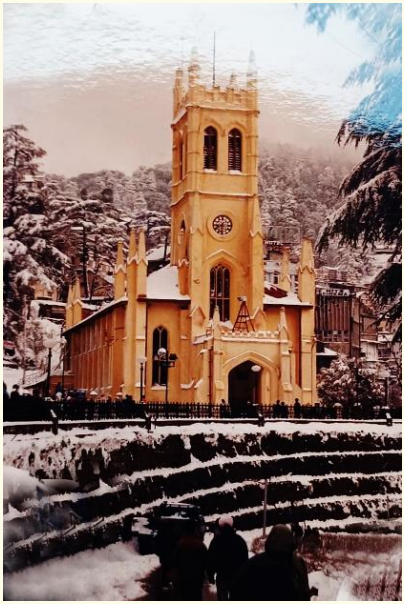

ম্যাল থেকে চার্চ

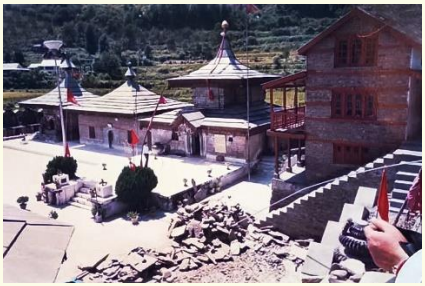

সিমলা

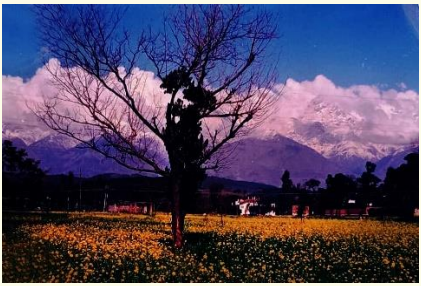

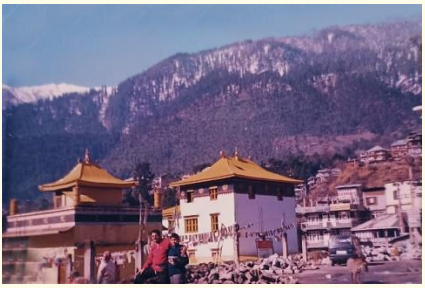

মানালী

স্বামী বিবেকানন্দ

শান্তশীল দাশ

উপনিষদের অভয় মন্ত্র
দিলে জনে জনে হে মহীয়ান,
‘নির্ভয় হও, জান আত্মাকে
তুমি ছোট নও, তুমি মহান।’
বীর সন্ন্যাসী, তোমার মাঝারে
দেখেছি হে দেব, তুমি একাধারে
জ্ঞান ও ভক্তির মূর্ত প্রতীক
মানবশ্রেষ্ঠ হে মহাপ্রাণ।
তোমার ও রূপ কী তেজোদীপ্ত,
কাছে এলে সব জড়তা ক্ষয়;
নিজ সত্তাকে খুঁজে পাই যেন
চির সুন্দর দীপ্তিময়।
‘তুমি মেষ নও। হও জাগ্রত,
চল নির্ভয়ে সিংহের মতো’
তোমার কণ্ঠে শুনি এই বাণী
মানবাত্মার দীপ্ত গান।

---

* জন্মতিথি স্মরণে

মুখ নেই

সুনন্দন ঘোষ

চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে কচ্ছের গ্রেটার রান,
সাদা নুনের আস্তরণে জারিত ধূ ধূ রেগিস্তান ,
মাইল দুয়েক দূরে রান উৎসবের টেন্ট সিটিতে আলোর দেওয়ালী।
একটা দু'টো পর্যটকদের বাস এসে দাঁড়াচ্ছে নরম অন্ধকারে।
দলে দলে জোড়ায় জোড়ায় অবয়বগুলো
ছড়িয়ে যাচ্ছে কাছ থেকে দূরে।
অস্তিত্ব আছে, পরিচয় নেই ...
শরীর আছে মুখ নেই।

এই লবনাক্ত আর্দ্র প্রান্তরে
আমিও নিজেকে হারিয়ে ফেলা
এক পরিচয়হীন অবয়ব।

একঘন্টা কাটল, দেড় ঘন্টা কাটল,
বাস ফিরে এল বিদ্যুৎ ঝলমলে আধুনিক তাঁবুতে।
কাঠের ফ্রেমে ঝকঝকে আয়না।
সামনে দাঁড়ালাম।
শরীর আছে, কাপড় আছে,
মুখ নেই।

আর জি করের মেয়েটা কবে যেন
আমাদের সকলের শরীর থেকে মুখগুলো মুছে দিয়ে গেছে।